(জ) কৈবর্ত বিদ্রোহ ঃ দিব্য বা দিব্বোক নামে কৈবর্ত বংশোদ্ভুত এক সামন্তরাজ দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করেন। এই বিদ্রোহে পালরাজ নিহত হন। কৈবর্ত বিদ্রোহ শুধু পালরাজবংশের পরিবর্তন সূচিত করেছিল নাকি এর মধ্যে গণবিদ্রোহের ইঙ্গিত ছিল অথবা এটি সামন্তরাজদের এক সুসংগঠিত অভ্যুত্থান, এ প্রশ্নে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। এই বিতর্কের মুখ্য কারণ বিদ্রোহ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক উপাদানের স্বল্পতা। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্য, যা দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাবে লিখিত, কৈবর্ত বিদ্রোহ সম্পর্কে একমাত্র লিখিত উপাদান। সন্ধ্যাকর নন্দীর বিরুদ্ধে পালরাজাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও দিব্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক মনোভাবের অভিযোগ এসেছে। কারণ তাঁর পিতা ছিলেন পালরাজদের মন্ত্রী ও তিনি নিজে ছিলেন রামপালের সভাকবি। ফলে তাঁর পক্ষে নির্ভীক ভাবে প্রকৃত তথ্য বিবৃত করা সম্ভব ছিল না।

রামচরিতে স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে দিব্যই বিদ্রোহী সামন্তদের নেতৃত্ব দেন বা মহীপালের বিরোধীপক্ষে যোগ দেন। রামচরিতে কৈবর্ত বিদ্রোহকে 'অপবিত্র ধর্মবিপ্লব' আখ্যা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এই বিদ্রোহে ধর্ম লঙ্ঘিত হয়েছে। ক্ষমতা দখলের এই জটিল রাজনীতিকে লেখক কর্তব্যচ্যুতি বলে মনে করেছেন। সেইজন্য দিব্যকে তিনি 'দস্যু' আখ্যা দিয়েছেন। দিব্য ছিলেন 'উপাধিব্রতী' অর্থাৎ তিনি কর্তব্যপালনের ছদ্মবেশ ধারণ করে উচ্চাকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কৈবর্তদের পরিচয় নিয়েও ঐতিহাসিকরা একমত নন। কারও মতে তারা কৃষিজীবী, কেউ কেউ তাদের মৎস্যজীবী বলে মনে করেন, অনেকে তাদের মাহিষ্য বলে দাবি করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যিনি রামচরিত সম্পাদনা করেছেন, মনে করেন কৈবর্তরা ছিল কৃষিজীবী ও যুদ্ধপ্রিয় সম্প্রদায়।

অনেকে মনে করেন বৌদ্ধ পালরাজাদের সঙ্গে হিন্দু মৎস্যজীবী কৈবর্তদের বিরোধ দেখা দিলে ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগ নিয়ে কৈবর্তরা বিদ্রোহ করে। কিন্তু পালরাজারা ধর্মের ব্যাপারে উদার মনোভাব পোষণ করতেন ও কৈবর্তসহ অন্যান্য হিন্দুদের নির্যাতিত হওয়ারও প্রমাণ নেই। তাছাড়া উভয় ধর্মের মধ্যে কার্যত কোনো বিরোধিতা ছিল না। রমেশচন্দ্র মজুমদার দ্বিতীয় মহীপালের কুশাসন ও কৈবর্তদের ওপর তাঁর অত্যাচারের তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। তিনি এই বিদ্রোহকে পাল শক্তির পতনের কারণ হিসাবে না দেখে তার ফল হিসাবে দেখেছেন। সম্প্রদায় হিসাবে কৈবর্তরা বিদ্রোহে অংশ নেয়নি, দ্বিতীয় মহীপালের কুশাসনের হাত থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েও দিব্য বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেননি। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে আর পাঁচটি সাধারণ বিদ্রোহের

মত দিব্যের বিদ্রোহও ছিল দুর্বল ও ভ্রাতৃবিরোধে ক্লিষ্ট পাল শাসনের বিরুদ্ধে এক সামন্তবিদ্রোহ। দিব্যের পেছনে জনসমর্থন ছিল বলেও তিনি মনে করেন না।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও যদুনাথ সরকারের মতো পণ্ডিতগণ দ্বিতীয় মহীপালের কুশাসন ও দিব্যের পেছনে জনসমর্থনের কথা মেনে নিয়েছেন। পালরাজ এত অত্যাচারী ছিলেন যে নিজের ভাইদেরও বন্দী করে রাখেন। তাঁর অত্যাচারে কৈবর্ত সম্প্রদায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, একই কারণে সামন্তরাও বিদ্রোহ করে। দিব্য যদি 'দস্যু' হন ও বেআইনীভাবে সিংহাসন দখল করেন তাহলে তিনি ও তাঁর বংশধরগণ তিন প্রজন্ম ধরে সিংহাসনে আসীন থাকতে পারতেন না। দিব্য ও তাঁর উত্তরাধিকারী ভীমের বিরুদ্ধে সাহায্য লাভের জন্য বারবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও রামপাল বাংলার সামন্তরাজদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হন। শেষ পর্যন্ত কর হ্রাস সহ অন্যান্য সুবিধাদানের প্রলোভন দেখিয়ে তিনি তাদের নিজ পক্ষে নিয়ে আসেন। অতএব দিব্যের পেছনে জনসমর্থনের তত্ত্বকে পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না। কৈবর্ত বিদ্রোহের মধ্যে গণজাগরণের কিছু ইঙ্গিত থাকলেও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এর সামাজিক তাৎপর্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেন না। তাঁদের মতে এই বিদ্রোহ প্রমাণ করে যে তৎকালীন বাংলাদেশে সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতাবাদ রাষ্ট্রের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। সামন্ততন্ত্র সাময়িক ভাবে জয়ী হলেও স্বল্পকাল পরে পালরাজশক্তি আবার ফিরে আসে।

(ঝ) পালরাজদের প্রত্যাবর্তন, রামপাল (১০৭২-১১২৬ খ্রীঃ) ঃ দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর শূরপাল ও রামপাল মগধে আশ্রয় নেন। শূরপালের পর ১০৭২ খ্রীঃ-এ রামপাল মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১১২৬ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। দিব্যের জীবদ্দশায় তিনি বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। দিব্যের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই রুদ্দোক বা রুদ্র ও রুদ্দোকের পর তাঁর পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। বরেন্দ্রী অধিকার নিয়ে রামপালের সঙ্গে ভীমের সামরিক সংঘাত শুরু হয়। প্রচুর পরিমাণ জমি ও অর্থের বিনিময়ে রামপাল বহু সংখ্যক সামন্তরাজের সমর্থন আদায়ে সমর্থ হন। এই সামন্তরাজদের অধিকাংশই দক্ষিণ বিহার ও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের। একমাত্র কৌশাম্বী ছিল বরেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত। এই ভাবে শক্তি সঞ্চয় করে রামপাল ও তাঁর সেনাপতি শিবরাজ গঙ্গা অতিক্রম করে বরেন্দ্রভূমি পুনরুদ্ধার করেন। ভীমকে পরাস্ত ও সপরিবারে হত্যা করা হয়। জলসেচ ও কৃষির উন্নতিসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে রামপাল তাঁর শাসনকে সুদৃঢ় করেন। গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমস্থলে রামাবতীতে নতুন রাজধানী স্থাপিত হয়।

কৈবর্ত বিদ্রোহের সমস্যা সমাধানের পর রামপাল পূর্ব সীমান্তের রাজ্যগুলি পুনরুদ্ধার করে দক্ষিণে রাঢ়দেশের দিকে অগ্রসর হন। রাঢ়ভূমির সামন্তবর্গ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। এর পর তিনি চোড়গঙ্গরাজ অনন্তবর্মনের কাছ থেকে উড়িষ্যা অধিকার করেন। রামপালের মৃত্যুর পর অবশ্য উড়িষ্যা পুনরায় চোড়গঙ্গদের অধিকারে ফিরে যায়। চালুক্য ও গাহড়বাল শক্তির সঙ্গেও রামপালকে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে হয়। এই দুই আক্রমণ প্রতিহত করতে তিনি সমর্থ হন।

রামপাল ছিলেন পালবংশের শেষ উল্লেখযোগ্য নৃপতি। কৈবর্তরাজ ভীমকে পরাস্ত করে বরেন্দ্রভূমি পুনরুদ্ধার, পূর্ব সীমান্ত ও রাঢ়দেশ অধিকার, উড়িষ্যা বিজয়, চালুক্য ও গাহড়বাল আক্রমণ প্রতিরোধ প্রভৃতি কর্তব্য সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করে রামপাল শেষবারের মত পালরাজশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সমর্থ হন। সামরিক দক্ষতার পাশাপাশি তাঁর প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক বিচক্ষণতাও প্রশংসনীয়। তাঁর মৃত্যুর পর সুদীর্ঘ পালশাসনের পতনকে আর রোধ করা যায়নি।